রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

- বিপুল সাহা

১।

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য জগতের দুই প্রখ্যাত মনীষী। একজন সাহিত্যের সাধক অন্যজন বিজ্ঞানের। এই দুই বিরল ব্যক্তি(ত্বের মধ্যে সরাসরি সংযোগ হয়েছিল ১৯২৬ সালে। কবির দ্বিতীয় দফার জার্মানি ভ্রমণের সময়। জার্মান ভাষায় সেবার গুণমুগ্ধ আইনস্টাইন কবিকে লেখেন – 'জার্মানিতে যদি এমন কিছু থাকে যা আমি আপনার জন্যে করতে পারি তবে যখন খুশী দয়া করে আদেশ করবেন।'

দুজনের মধ্যে প্রথম দর্শন হয় ১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই বার্লিনের বাইরে পটসডামের কাছে কাপুথ শহরে বিজ্ঞানীর বাড়িতে। সেবার দুই মনীষীর মধ্যে দর্শনের গু(ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছিল। তখন কবির বয়স প্রায় সত্তর। বিজ্ঞানী তাঁর থেকে আঠেরো বছরের ছোট। এমন দুই বিরল ব্যক্তিত্ব যখন তাত্ত্বিক আলোচনা করতে বসেন তখন তাঁরা কি কথা বলেন? কেমন করে বলেন? বলা বাহুল্য এমন দুই ব্যক্তিত্বের আলাপচারিতা বিষয় ও বিষয়ীর কারণে অতীব গু(ত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এই দুই মনীষীর আলোচনার বিবরণ জানতে উৎসুক।

উপরোক্ত সা(াতের পরে আরো তিনবার উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল। ১৯৩০ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে হয় বার্লিনে এবং ডিসেম্বরে নিউইয়র্কে। বিষয়ের গুর(ত্বে প্রথমবারের আলাপচারিতা গবেষক এবং অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরাও সেই প্রথম আলোচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করব। তবে তার আগে ঐ সময়ের সামগ্রিক পটভূমি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) বাংলার কবি হলেও তাঁর আবেদন ভারতও বিশ্বের দরবারে। কবিগু(হিসেবে শুধু নয়, সম্মানিত হয়েছেন চিন্তাবিদ হিসেবেও।

একজন ভারতীয় হিসেবে প্রথম নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন ১৯১৩ সালে। সাহিত্যে। ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত(এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা পিতা দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারায় অনুপ্রাণীত রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। এক নিয়ন্ত্রক আছেন, কখনো তিনি পিতা, কখনো নাথ প্রভু স্বামী বা জীবনদেবতা। আলোচ্য কথোপকথনেও পরম মানব, মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্ব, পরাব্যক্তিক মানুষ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের মধ্যে তাঁর ঔপনিষদ ভাবনার প্রতিফলন দেখি। এক জীবনে স্বাদেশিকতা- জাতীয়তাবোধেও উদ্দীপিত হয়েছেন, আবার উত্তর জীবনে উত্তীর্ণ রয়েছেন বিশ্বমানবতা বোধে। ১৯৩০ সালে তখন তিনি সদ্য অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃ(তা দিয়েছেন। মানুষের ধর্ম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন।

আমরা জানি কবি বাল্যবয়স থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। নিউটনের ধ্রুপদী ধারণার অবসান হয়েছে কিছুদিন আগে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার হাল হকিকত সম্পর্কে তিনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন? বেশ কিছুটা যে ছিলেন তা আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপচারিতায় বোঝা যায়। এক বছর আগে বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ কলকাতা আসেন। বোর-হাইজেনবার্গের অনির্দেশ্যতা, বাস্তবতার সমস্যা ইত্যাদি বিষয় তাঁর ঔপনিষদ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। হাইজেনবার্গ কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এতই আনন্দিত হন যে জীবনের উপান্তে এসেও তিনি তা ভোলেন নি।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) বিংশ শতকের সেরা বিজ্ঞানী। ম্যাক্স প-্যাঙ্ক শক্তি-কণা সম্পর্কে যে ভাবনার প্রকাশ করেন ১৯০০ সালে এবং তাকেই তিনি ১৯০৫ সালে আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। ঐ বছরে তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেন সাধারণ আপেখি'কতার তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের এক পরিণাম নিয়ে ১৯১৯ সালে পরীখ'া হয়। সেখানে আপেখি'কতার তত্ত্ব প্রবলভাবে সমর্থিত হয়। দেশেদেশান্তরে আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

প্রথম জীবনে আইনস্টাইন দৃষ্টবাদী (পজিটিভিস্ট) ভাবনার শরিক ছিলেন। এই দার্শনিক ভাবনায় প্রাকৃতিক ঘটনা তখনই মানা হয় যখন তা পর্যবেখ'ণ এবং পঞ্জীকৃত করা হয়। অর্থাৎ বিশ্বের বস্তুজগত সম্বন্ধেও পর্যবেখ'ণলব্ধ জ্ঞান না হলে তা অর্থহীন হয়ে যায়। বাস্তবতা তাহলে মানুষের জানা বিশ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোয়ান্টাম তত্ত্বে দৃষ্টবাদী ভাবনার অঙ্গীকার আছে। তারপর ১৯২৫ সাল নাগাদ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশ হয়।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক বোর, হাইজেনবার্গ, ব্রগলি, পউলি, শ্রোয়ডিঙ্গার ইত্যাদি বিজ্ঞানীদের দ্বারা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যে ব্যাখ্যা গৃহীত হয় তা কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা নামে পরিচিত হল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইলেকট্রন জাতীয় বস্তু আসলে কী, এমন প্রশ্ন অর্থহীন। পদার্থবিদ্যা তার যথাযথ উত্তর দিতে অপারগ। বরঞ্চ বলতে পারে ঐ বস্তুর সম্ভাব্য দর্শন কেমনধারার হবে। দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই বাস্তব নয়। বাস্তবতা নির্ভর করে আমাদের অস্তিত্ব তথা চেতনার উপর। যতকাল আমরা আছি, ততকাল বস্তুসামগ্রী আছে।

এই ভাবনার সঙ্গে আইনস্টাইন একমত হতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন বস্তুজগতের বাস্তবতা মানব নিরপেখ'। দ্রষ্টার উপর তা নির্ভরশীল নয়। উত্তরকালে তিনি রিয়ালিস্ট বা বাস্তববাদী ভাবধারায় প্রাণীত হন। তাঁর মতে কোয়ান্টাম বিদ্যা অসম্পূর্ণ। আমরা জানি তিনি গতানুগতিক ধারণার ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। অর্থাৎ জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতায়, স্পিনোজার ঈশ্বরকে।

৩।

কবি ও বিজ্ঞানীর প্রথম সাখ'াতকারের দুটি বিবরণ আছে। একটি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঐ বছরের ১০ই আগস্ট। লেখক ছিলেন আইনস্টাইন-তনয়া মার্গটের হবু স্বামী দিমিত্রি মারিয়ানফ। তিনি আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন। বিবরণ সম্পূর্ণ নয়। সাংবাদিক-লেখক বলেছেন তিনি যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই লিখেছেন। মনে হয় সেই বিবরণ বিজ্ঞানীর অনুমোদন লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় বিবরণ প্রকাশিত হয় কলকাতার 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায়। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এবং নোট রেখেছিলেন। তাঁর নোটের উপর ভিত্তি করে এটি কথোপকথনের আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবির সুপরিচিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এটি কবির অনুমোদিত বয়ান হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। পরে কবির রচনা 'The Religion of Man' রচনায় তা পরিশিষ্টে স্থান পায়।

উভয় বিবরণে বেশ কয়েকটি জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা করা যায়। বর্ণনায় তফাত বোঝানোর জন্য আমরা কবি বা বিজ্ঞানীর বাক্যের পরে নিউইয়র্ক

টাইমস (NYT) এবং মডার্ন রিভিয়ুর (MR) সূত্র উল্লেখ করছি। মারিয়ানফ পটভূমিতে অনেক কথা লিখেছেন। স্থানাভাবে তা বর্জিত হল।

৪।

কবি বললেন – আপনি ব্যস্ত রয়েছেন দুটি সুপ্রাচীন বিষয়, দেশ-কাল (space and time) নিয়ে, গণিতের মাধ্যমে গবেষণায় আর আমি এদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি মানুষের চিরন্তন জগত (eternal world of man), বাস্তবতার বিশ্ব (the universe of reality) নিয়ে। (NYT)

পূর্বোক্ত ভূমিকাটুকু থাক বা না থাক, তারপরেই বিজ্ঞানী একেবারে মূল প্রশ্নে প্রবেশ করলেন। কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন – জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরকে কি আপনি বিশ্বাস করেন? (NYT/MR)

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে কবি বললেন – না, বিচ্ছিন্ন করে নয়। মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্ব (the infinite personality of man) সমগ্র বিশ্বকে অনুধাবন করে। এমন কিছু হতে পারে না যা মানবিক ব্যক্তিত্বের (human personality) নাগালের বাইরে। আর তা থেকেই প্রমাণিত হয় বিশ্ব-সত্য হল মানবিক সত্য। (NYT/MR)

মডার্ন রিভিয়ু অনুসারে আরো কিছু কথা এখানে কবি বলেছেন। তিনি বলেন – একথার ব্যাখ্যা করতে আমি একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্য নিয়েছি। বস্তুপদার্থ প্রোটন এবং ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত এবং তাদের মধ্যে ফাঁক আছে(অথচ অন্তবর্তী দেশে (space) তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছাড়াই বস্তুসামগ্রীকে নিরেট বলে মনে হয় এবং এই ব্যাপারটা প্রত্যেক ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে একত্রিত করে। একই রকমভাবে মনুষ্যত্ব অনেক ব্যক্তি(মানুষের যোগফল, তবু তাদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের অন্তঃসংযোগ আছে যা মানুষের জগতকে এক জীবন্ত ঐক্যে গ্রথিত করে। একই রকমভাবে সমগ্র বিশ্ব যুক্ত রয়েছে আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের পরিচয়ে(এ বিশ্ব মানবিক বিশ্ব ।

কবি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তবে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। 'মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্ব' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কী সমস্ত মানবের সামুদায়িক চৈতন্যের কথা বলছেন? দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনায়, তিনি 'পরস্পর সমন্বিত বহু মানুষের সামুদায়িক মন' এরকম অর্থে কথাটি ব্যবহার করেছেন। তার পরেও

'অনন্ত' বলার মধ্যে অন্য ইঙ্গিত আছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। আবার এই বিশ্ব যে এক অর্থে মানবিক বিশ্ব তা নিয়ে দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানী – বিশ্বের স্বরূপ নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র ধারণা আছে - জগত একীভূত সত্তা (unity) হিসেবে মানুষের উপর নির্ভরশীল অথবা জগত মানবনিরপেখ' বাস্তবতা। (NYT/MR)

উত্তরে কবি সত্য-সুন্দরের ব্যাখ্যা দিলেন – যখন আমাদের বিশ্ব চিরন্তন মানুষের (man, the eternal) সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে তখন আমরা তাকে সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব করি। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী আবার তাঁর মূল প্রশ্নে ফিরে গেলেও, কবি সোজাসুজি কোন উত্তর দিলেন না। পরিবর্তে সত্য ও সুন্দর নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন। বিজ্ঞানী তখন বললেন – এ তো বিশ্ব সম্পর্কে পুরোপুরি একটি মানবিক ধারণা (human conception of the universe)। (NYT/MR)

কবি – জগত সম্পর্কে বিশুদ্ধ মানবিক ধারণা ব্যতীত অন্য কোন ধারণার মধ্যে আর কোন সত্য থাকতে পারে না। (MR)

এ জগত মানবিক জগত। এর সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত যে ধারণা তাও বৈজ্ঞানিক মানুষের ধারণা। তাই আমাদের বাদ দিয়ে জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ জগত হল আপেখি'ক জগত যার বাস্তবতা আমাদের চৈতন্যের উপর নির্ভর করে। যুক্তি এবং উপভোগের একপ্রকার মাপকাঠি আছে যা তাকে সত্য প্রতিপন্ন করে। সে মাপকাঠি চিরন্তন মানুষের মাপকাঠি (the standard of eternel man)। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই চিরন্তন মানুষের অভিজ্ঞতা সম্ভবপর হয়। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী – এ তো মনুষ্যসত্তার (human entity) উপলব্ধি। (NYT/MR)

কবি – হ্যাঁ, এক চিরন্তন সত্তার উপলব্ধি। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আমাদের আবেগ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে। আমরা আমাদের সকল সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সেই পরম মানবের (supreme man) উপলব্ধিতে পৌঁছই যার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সীমাবদ্ধতাগুলো নেই। ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন বিষয় নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার(এ হল নৈর্ব্যক্তিক মানবিক সত্যের জগত। ধর্ম এসকল সত্য উপলব্ধি করে এবং আমাদের গভীরতর প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে। সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত চেতনা তখন সর্বজনীন মর্যাদা পায়। ধর্ম সত্যের উপর মূল্য আরোপ করে এবং আমরা সত্যকে কল্যাণকর

বলে জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী – তাহলে সত্য বা সৌন্দর্য মানবনিরপেখ' নয়? (NYT/MR)

কবি – না (NYT/MR) নয়, (অন্ততঃ) আমি তা বলি না। (NYT)

বিজ্ঞানী – যদি কখনো কোনো মানুষের আর অস্তিত্ব না থাকে তবে বেলভিডিয়ারের অ্যাপোলো আর সুন্দর থাকবে না। (NYT/MR)

কবি – না। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী – আমি সৌন্দর্যের এমন ধারণা মেনে নিতে পারি কিন্তু সত্যের ধারণা নয়। (NYT/MR)

কবি – কেন নয়? সত্য মানুষের মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয়।

বিজ্ঞানী – আমি আমার ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারব না কিন্তু এই হল আমার ধর্ম। (NYT/MR)

(সত্য সম্পর্কে আইনস্টাইন যা বলতে চেয়েছেন তা তিনি অন্যদের বোঝাতে পারেন নি। অথবা অন্যরা তা বুঝতে চাননি। বোর ইত্যাদির দ্বারা ব্যাখ্যাত বাস্তবতার ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন আইনস্টাইন। আমৃত্যু।

এখানে বলে নিতে হবে তত্ত্ব হিসেবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সফলতম হলেও এই তত্ত্ব কোন সর্বাত্মক ধারণার জন্ম দিতে পারে নি। হাইজেনবার্গ নিজেই বলেছেন – The laws of nature formulate mathematically in quantum theory deal no longer with the elementary particles themselves but with our knowledge of the particle. এই বলবিদ্যা এখনো জানাতে পারেনি, বস্তুপদার্থের সূক্ষ্মতম স্তরে যা ঘটে, দৃশ্যমান স্তরে তেমন হয় না কেন? সেখানে কেন আমরা এমন অনির্দেশ্যতার ঘটনা দেখি না? এমন দোলাচল দেখি না? তাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা শেষ কথা বলে ফেলেছে এমন কথা বলা যায় না।

একথা সত্য যা কিছু আমরা জানি তা আমাদের চেতনার মাধ্যমে। আমাদের স্নায়ু-মগজের জটিলতম ক্রিয়াকলাপের ফলে। একথাও সত্য যে আমরা যা জানি তা জগতের বাস্তবতাই সূচিত করে। জগতকে অবাস্তব প্রতিপন্ন করে না। গাছটা আছে তা আমরা ইন্দ্রিয়-মগজের মাধ্যমে জানি। সেই জানা সঠিক হলে, একই সঙ্গে এও জানি যে গাছটার অস্তিত্ব আমাদের দেখার উপর নির্ভর করে নেই। আমরা দেখলেও গাছটা আছে, না দেখলেও গাছটা আছে। মানুষ যেদিন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি তখনো

পৃথিবী ছিল, প্রকৃতিজগত ছিল। এটা মানতে তো সমস্যা হচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায় যা কিছু জানি, তা মানবিক সত্য বটে তবে একই সঙ্গে কিয়দংশ নৈর্ব্যক্তিক সত্যও হতে পারে। বস্তুজগত বলতে সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্যের জগতের কথা বলা হয়। মানুষের ভাবনাচিন্তা-নির্ভর ভাবজগত আরো মানবিক ও ব্যক্তি(নির্ভর। সুতরাং সত্যজ্ঞান সর্বথা মানবিক হলেও বস্তুজগত মানব নিরপেখ' । এই তফাতটা বুঝতে না চাইলে সত্যদর্শন হবে না।)

কবি – সর্বজনীন সত্তায় বিদ্যমান নিখুঁত মেলবন্ধনের আদর্শের (ideal of perfect harmony) মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত(সত্য সর্বজনীন মনের (Universal Mind) নিখুঁত উপলব্ধিতে। আমরা ব্যক্তিমানুষেরা আমাদের নিজস্ব ভুল ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আমাদের আলোকিত চেতনার মধ্য দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই। তা ছাড়া আর কিভাবেই বা আমরা সত্যকে জানতি পারি। (NYT/MR)

(সত্যকে আলাদা সত্তা হিসেবে মান্য করা এক প্রবণতা। সত্য কি? জ্ঞাতব্য জগতকে যথাযথ বর্ণনা করা বা তার গুণাবলী জানার এক অবস্থা হল সত্য। সত্য এক গুণাবস্থা। এটি বিশেষণমূলক। কোন ঘটনা সত্য হয় বা কোন বর্ণনা সত্য হয়। ঘটনা বা বর্ণনা ব্যতীত সত্য বলে কিছু হয় না।)

এরপর বিজ্ঞানীর উত্তর ঠিক কি ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। নিউইয়র্ক টাইমস অনুসারে বিজ্ঞানী বলেছেন – আমি প্রমাণ করতে পারব না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পিথাগোরাসের যুক্তিতে যেখানে সত্য মানবনিরপেখ' বলা হয়। এ হল সন্ততির যুক্তির (logic of continuity) সমস্যা। (NYT)

মডার্ন রিভিয়ু অনুসারে বিজ্ঞানী উত্তরে বলেছেন – আমি প্রমাণ করতে পারব না যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেও সত্য বলে মান্য করতে হবে যা মনুষ্যত্ব ব্যতিরেকে ও সিদ্ধ(কিন্তু আমি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, যেমন, জ্যামিতির পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যে যা কিনা মোটামুটিভাবে সত্য, মানুষের অস্তিত্বনিরপেখ'তায়। যাই হোক, মানব নিরপেখ' বাস্তবতা বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেই বাস্তবতার সাপেখে' সত্যও আছে(একই রকমভাবে প্রথমটির অস্বীকৃতি (negation)পরবর্তীর অস্তিত্বের অস্বীকৃতির কারণস্ব(প হয় (engenders)। (MR)

আবার রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে রখি'ত এবং The Religion of Man-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত বিবরণে বলা হয়েছে বিজ্ঞানীর উত্তর ছিল এই রকম – আমি

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে পারব না যে সত্যকে মানবনিরপেখ' সত্য হিসেবেই ভাবতে হবে(কিন্তু আমি তা দৃঢ়ভাবে বি(্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, যেমন, জ্যামিতির পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যে যা কিনা মোটামুটিভাবে সত্য, মানুষের অস্তিত্ব নিরপেখ'তায়। যাই হোক, মানবনিরপেখ' বাস্তবতা বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেই বাস্তবতার সাপেখে' সত্যও আছে(একই রকমভাবে প্রথমটির অস্বীকৃতি বা নএ(করণ (negation) পরবর্তীর অস্তিত্বের নএ(করণের বিপদ ডেকে আনে (endangers)।

এর পরে উভয় সংবাদ আবার অভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছে।

কবি বলছেন – সত্য সর্বজনীন সত্তার থেকে অভিন্ন হলেও অবশ্যই মানবিক(তা না হলে, আমরা ব্যক্তিমানুষেরা যা কিছু সত্য বলে মানি, তাকে সত্য বলা যেত না, অন্ততপখে' বৈজ্ঞানিক সত্য বলে যা বর্ণিতএবং যা যুক্তিপ্রক্রিয়া দ্বারা কেবলমাত্র লভ্য, অন্যভাবে বলা যায় যা মননের এক মানবিক যন্ত্র মারফত অনুধাবিত। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মণ (Brahman) আছেন, পরম সত্য (absolute truth), যাঁকে ব্যক্তিমনের বিচ্ছিন্নতায় ধারণা করা যায় না বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার অনন্তের (infinity) মধ্যে একাত্ম করতে পারলেই তার উপলব্ধি হয়। এ ধরনের সত্য বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। সত্যের যে প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা প্রতীয়মানতা (appearance) অর্থাৎ কিনা মানুষের মনে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়(ফলে তা মানবিক, হয়তো তাকে বলা যেতে পারে মায়া (Maya) বা বিভ্রম (illusion)। (NYT/MR)

(কবিভাবনায় সমস্ত জ্ঞানই মানবিক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও মানবিক কেননা তা মানুষেরই মননযন্ত্র দ্বারা সংগৃহীত। ব্রহ্মণ বা পরমসত্য বিজ্ঞানের বিষয় তো নয়ই। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ কেন? মায়া বা বিভ্রম ভাবতে বসলে তো সবই প্রতীয়মানতা, সত্যমিথ্যা বিষয়ে উদাসীন থাকা। আইনস্টাইন বলছেন জগতের মানবনিরপেখ' সত্যের কথা। তা মানবিক হলেও তার মানবনিরপেখ' অস্তিত্ব বর্তমান। তার কথা। আসলে দুজনের আলোচ্য বিষয় দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়েছে।)

এরপর আবার সূত্রের বিবরণে ভিন্নতা এসেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের মতে বিজ্ঞানী বলছেন – এই বিভ্রম ব্যক্তিমানুষের নয়, সমগ্র প্রজাতির (species)।

কবি – প্রজাতিও একত্বের তথা মনুষ্যত্বের অন্তর্ভূক্ত। তাই সমগ্র মানবমন সত্য উপলব্ধি করে(ভারতীয় এবং ইউরোপীয় মানসিকতা উভয়ে এখানে একই উপলব্ধিতে মিলিত হয়।

এরপর মারিয়ানফের তথ্যসংগ্রহে ছেদ পড়েছে যদিও বিজ্ঞানীর পরবর্তী বাক্যে ঠিক তা মনে হয় না।

বিজ্ঞানী বলেছেন – প্রজাতি শব্দ জার্মান ভাষায় মানুষের খে'ত্রে প্রযুক্ত হয়(বলতে কী, বনমানুষ এবং ব্যাঙও এই প্রজাতির মধ্যে পড়ে। সমস্যা হল সত্য মানুষের চেতনানিরপেখ' কি না।

মডার্ন রিভিয়ু লিখছে অন্য কথা। সেখানে বিজ্ঞানী বলছেন – তাহলে আপনার ধারণা, মানে যাকে ভারতীয় ধারণা বলা যেতে পারে, সেই অনুসারে তা ব্যক্তিমানুষের বিভ্রম নয় বরঞ্চ সামগ্রিক মানবজাতির। (MR)

কবি – বিজ্ঞানে আমরা আমাদের ব্যক্তিমনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার শিখ'ার মধ্য দিয়ে যাই এবং অবশেষে সত্যর উপলব্ধিতে পৌঁছই যে সত্য বিশ্বমানবের মনে বর্তমান। (MR)

বিজ্ঞানী – সমস্যার শুর্, সত্য আমাদের চেতনানিরপে(কিনা সেই প্রশ্নে। (MR)

সমস্যার প্রশ্নটা উভয় বিবরণেই আছে। উত্তরে কবি বলছেন – যাকে আমরা সত্য বলি, তা বাস্তবতার বিষয়মুখী (objective)এবং আত্মমুখী (subjective) এই দুদিকের যুক্তিগ্রাহ্য সংহতির অন্তর্গত(আর উভয়েই পরাব্যক্তিক মানুষের (super-personal man) অঙ্গীভূত। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী – আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও, আমরা আমাদের চারপাশে যে বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করি তাতে মানব নিরপেখ' বাস্তবতা আরোপ করতে বাধ্য হই। আমরা তা করি যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে। যেমন ধরুন, বাড়িতে কেউ না থাকতে পারে তবু ওই টেবিলটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। (NYT/MR)

কবি – হ্যাঁ, তা ব্যক্তিমনের বাইরে থেকে যায় কিন্তু সর্বজনীন মনের বাইরে নয়। যে টেবিল আমি উপলব্ধি করছি তা আমার মতো একই রকমের চেতনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (NYT/MR)

বিজ্ঞানী – যদি ঘরে কেউ না থাকে, তবু টেবিলটা বর্তমান। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তা ইতিপূর্বে রীতিবি(দ্ধ, কেননা আমরা ব্যাখ্যা করতে অপারগ যে আমাদের উপর নির্ভর না করেই টেবিলটা যে ওখানে আছে, তার অর্থ কি! (NYT)

মানবাতীতসত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করা যায় না(কিন্তু এ হল এমন এক বিশ্বাস যা কেউ ত্যাগ করতে পারে না, এমনকি আদিম মানুষেরাও পারে না। আমরা সত্যের উপর এক অতিমানবিক বিষয়মুখিনতা (super humsn objectivity) আরোপ করি, আমাদের কাছে তা অপরিহার্য, এই বাস্তবতা আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের মন থেকে নিরপেখ', যদিও আমরা বলতে পারি না এসবের কী অর্থ। ((NYT/MR)

কবি – বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে টেবিল এক কঠিন বস্তু হিসেবে এক প্রতীয়মানতা, এবং সেকারণে যা মানুষের মন টেবিল হিসেবে প্রত্যখ' করছে, তা আর থাকে না যদি মন না থাকে। সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে, টেবিলের অন্তিম বস্তুগত বাস্তবতা আসলে পৃথকভাবে একদল পরিভ্রমণরত বৈদ্যুতিক বলের কেন্দ্র ব্যতীত কিছুই নয় এবং তাও মানবমনের অন্তর্গত।

সত্যের অনুভবে বিশ্বজনীন মানবমনের সঙ্গে ব্যক্তিমানসে বন্দী মানবমনের চিরন্তন দ্বন্দ রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনে, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে তারই অবিরাম মীমাংসা প্রক্রিয়া চলে। (MR)

যাই হোক, যদি মনুষ্যত্বের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কহীন কোন সত্য থেকেও থাকে তবু আমাদের কাছে তা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। (NYT/MR)

এরকম একটি মনের কল্পনা করা শকত নয়, যেখানে বস্তুসামগ্রীর বিন্যাস দেশ-বিধৃত নয় বরঞ্চ কাল-বিধৃত, সঙ্গীতের সুরের মতো। এরকম মনের পখে' বাস্তবতার ধারণা অনেকটা সুরের বাস্তবতার মতো যেখানে পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্য অর্থহীন। কাগজের বাস্তবতা আছে, তা সাহিত্যের বাস্তবতা থেকে সীমাহীন রকমের ভিন্নতায়। যে মথপোকা কাগজ কুড়ে কুড়ে খায় তার মনের আঙিনায় সাহিত্যের ছিটেফোটা নেই, কিন্তু মানুষের মনের কাছে কাগজের থেকে সাহিত্যের সত্য-মূল্য অনেক বেশী। সেই প্রকারে, যদি এমন কোন সত্য থেকে থাকে যার সঙ্গে মানবমনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গত বা যুক্তি(বাদী সম্পর্ক রখ'া করে না, তা চিরকাল মূল্যহীন থেকে যাবে যতখ'ণ আমরা মানুষ হয়ে থাকব। (MR)

আলোচনার অন্তিম দশায় বিজ্ঞানীর পরিহাস – তাহলে আমি আপনার থেকে বেশী ধার্মিক। (NYT/MR)

কবি – আমার ধর্ম হল আমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পরাব্যক্তিক মানুষের তথা বিশ্বজনীন মানবাত্মার সামঞ্জস্যবিধান। (NYT/MR)

এটাই ছিল আমার হিবার্ট বক্তৃতামালার বিষয় যাকে আমি বলছি 'মানুষের ধর্ম'। (MR)

৫ ।

জুলাই মাসের এই আলোচনা প্রসঙ্গে অতৃপ্ত আইনস্টাইন কয়েক মাস পরে এক পত্রে লেখেন – 'তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা অসফল থেকে গিয়েছিল বিশেষ করে ভাববিনিময়ের সমস্যার জন্য এবং সেই কথাবার্তা কখ'নো প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল না।'

১৯শে আগস্ট তারিখে দ্বিতীয় সাখ'াতকারের যে বিবরণ আছে তা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ততটা গু(ত্বপূর্ণ নয়। এই সাখ'াতকারের নোটও রেখেছিলেন কবির পখ' থেকে অধ্যাপক অমিয় চত্র(বর্তী। পরে তা এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনা দিয়ে শু(হলেও ক্রমে তা সঙ্গীতের প্রসঙ্গে চলে যায়। আমরা তার প্রথমাংশ এখানে তূলে ধরব।

কবি – ডাক্তার মেণ্ডেলের সঙ্গে আজ আমি আলোচনা করছিলাম গণিতের নতুন আবিষ্কার নিয়ে, খু'দ্রাতিখু'দ্র পরমাণুর রাজ্যে আকস্মিকতার ভূমিকা আছে, অস্তিত্বের নাটক একান্তভাবে পূর্বনির্ধারিত নয়।

বিজ্ঞানী – বিজ্ঞানের সেই সব ঘটনা যা বিজ্ঞানকে এ রকম ধারণার দিকে নিয়ে যায়, তা কারণতত্ত্বকে বিদায় জানায় নি কিন্তু।

কবি – হয়তো নয়(কিন্তু মনে হচ্ছে হেতুবাদী ভাবনা মূল উপাদানে নেই। বরঞ্চ যেন অন্য কোন বল (force) তাদের সঙ্গে মিলে এই সুসঙ্গত জগত গঠন করছে।

বিজ্ঞানী – কেউ কেউ উচ্চ স্তরের ভাবনায় বুঝতে চায় এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস কিভাবে হল। এই শৃঙ্খলা সেখানে রয়েছে যেখানে বড়ো উপাদান সমূহ যুক্ত হয়ে অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে(কিন্তু সূক্ষ্ম উপাদানে তা অনুভব করা যাচ্ছে না।

কবি – এই দ্বিচারিতা অস্তিত্বের গভীরে আছে - স্বাধীন তাড়না ও চালক ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দরূপে এসবের উপর যা ত্রি(য়া করে এবং বস্তুর সুবিন্যস্ত পরিকল্পনায় উত্তীর্ণ হয়।

বিজ্ঞানী – আধুনিক পদার্থবিদ্যা বলবে না যে তারা দ্বান্দিক। দূর থেকে দেখলে মেঘ যেমন দেখায়, কাছ থেকে যদি দেখা যায় তবে দেখা যাবে যে তারা আসলে বিশৃঙ্খল জলবিন্দু মাত্র।

কবি – মনস্তত্ত্বে এর তূলনা দেখি। আমাদের ভাবাবেগ এবং আকাঙ্খা বিশৃঙ্খল কিন্তু আমাদের চরিত্র সেসব উপদানগুলিকে পর্যুদস্ত করে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রে। এরকমই কি বস্তুজগতে ঘটে? উপাদান সকল কি ব্যক্তিগত তাড়নায় বিদ্রোহী হয় ? বস্তুজগতে কি এরকম কোন নিয়ম আছে যা এসবের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে এবং এদের সুশৃঙ্খল সংগঠনে আবদ্ধ করতে পারে।

বিজ্ঞানী – এমন কি উপদান সকলও সংখ্যাতাত্ত্বের বিন্যাসের বাইরে নয়। রেডিয়ামের উপাদান সর্বদা তাদের নির্দিষ্ট ক্রম বজায় রাখে বর্তমানে এবং আগামী কালে, যেমন করে তারা করে এসেছে। তাহলে উপাদানের মধ্যেও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিন্যাস আছে।

কবি – তা না হলে অস্তিত্বের নাটক হত এলোমেলো। আসলে আকস্মিকতা এবং সংকল্পের চিরন্তন সামঞ্জস্যই একে সর্বদা নবীন ও জীবন্ত করেছে।

বিজ্ঞানী – আমি বিশ্বাস করি, আমরা যাই করি না কেন, বা যে উদ্দেশে জীবনধারণ করি না কেন, সবকিছুর মধ্যে কারণতত্ত্ব বর্তমান। অবশ্য এটা ভালো যে আমরা তার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই না।

কবি – মানুষের বেলায় এক স্থিতিস্থাপক উপাদানও আছে – স্বল্প পরিসরে কিছুটা স্বাধীনতা আছে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য। ....

কবি ও বিজ্ঞানীর এই আলাপচারিতা থেকে আমরা দুই মনীষীর দুই ধারার ভাবনার হদিশ পাই। তাঁরা দুজনে যে যার বিশ্বে অধীশ্বর হয়ে আছেন। আলোচনায় যেন যে যার কথা বলেই গিয়েছেন। কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন নি। এত সহজে পৌঁছনোর কথাও নয়।

এ ঘটনার পরে সত্তর বছরেরও বেশী সময় পার হয়েছে। আজও তার চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হয়নি।

(তথ্যসূত্র ঃ ১। রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান - দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়(২। বি(প্রকৃতি ও মানুষ - পার্থ ঘোষ।)

(অনুভাব, এপ্রিল ২০০৩)